ইউসুফ আল কারজাভি

হিজরী কাফেলা

ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক মুসলিম
প্রজন্ম গঠনের ইশতেহার

ফারুক আজম
অনূদিত

বিজয়ী কাফেলা

(ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক মুসলিম প্রজন্ম গঠনের ইশতেহার)

ফারুক আজম [অনূদিত]

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ার কোটি মানুষ এক সোনালি ভোরের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ। মুক্তির সূর্য উঠবে বলে স্বপ্ন বুনছে লাখো-কোটি বনি আদম। কিন্তু কীভাবে আসবে সে ভোর? কারা আনবে সে ভোর?

জাহেলিয়াতের আঁধার কেটে কেটে যারা নতুন সমাজ বিনির্মাণ করবে, তাদের চরিত্র নিঃসন্দেহে অনুপম এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া অনিবার্য। তামাম দুনিয়ার বৈরিতা ও শত্রুতা বরদাশত করে যারা নতুন এক দুনিয়া গড়ার কারিগর হতে চায়, তাদের পথটা যে কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারে না– তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

শুধু প্রত্যাশার পারদ ঊর্ধ্বে তুললেই হবে না; বিপ্লবীদের প্রথমে জানতে হবে, কাজটা আদতে কী। অন্ধকারে ঢিল ছুড়লে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আজকের দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম এবং ইসলামি চিন্তাবিদ ইউসুফ আল কারজাভি প্রত্যাশিত বিজয়ী কাফেলার চিত্র এঁকেছেন তাঁর *জিলুন নাসরিল মানসুদ* গ্রন্থে। মুক্তির আলোকমশাল যারা বয়ে বেড়াবে, কেমন হওয়া উচিত তাদের অবয়ব– লেখক এই গ্রন্থে অনুপম ভাষাশৈলীতে তা তুলে ধরেছেন। ইউসুফ আল কারজাভিকে নিয়ে নতুন কিছু বলা বাতুলতা বৈ কি! এই বিপ্লবী চিন্তকের অসাধারণ চিন্তাধারা বাংলাভাষী পাঠকদের মানসে তুলে ধরার দায় আমরা হৃদয়ের গহিন থেকে উপলব্ধি করছি।

তরুণ অনুবাদক ফারুক আজম ভাই অসাধারণ কাজ করেছেন, মাশাআল্লাহ! সম্মানিত পাঠকবৃন্দ প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই অনুবাদকের নিপুণ চিন্তার কারুকাজ দেখতে পাবেন। এই তরুণ এভাবে বাংলা সাহিত্যে অব্যাহতভাবে অবদান রাখলে বিশ্বাসীদের সাহিত্যদুনিয়া অনেক দূর এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার জন্য মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের কারিগরদের এতটুকুও উপকারে এলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২২ জুলাই, ২০২০

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তায়ালার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলামই মানবজাতির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, পথচলার নির্দেশিকা। জীবনপথের পাথেয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– 'আমি তোমাদের জন্য ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে নির্বাচন করেছি।' তাই ইসলামই পার্থিব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। আখিরাতের মুক্তির সোপান, যে সোপান পেরোলেই জান্নাত– অনন্ত জীবনের নিরাপদ ঠিকানা।

ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই মানুষকে মুক্তির পথে ডেকেছে। আলোর দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ইসলাম যাত্রা শুরু করেছে। মানবমুক্তির স্লোগানই ঈমানের অনন্তকালের যাত্রাকে মহিমান্বিত করেছে। তাই ইসলাম মানুষের মুক্তির সনদে, অধিকার ফিরে পাওয়ার মন্ত্রে পরিণত হয়। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। হেরার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় জনপদ, দেশ পেরিয়ে মহাদেশ। ইসলামের করতলগত হয় মহাবিশ্ব!

কিন্তু ইসলামের এই যাত্রা নিষ্কণ্টক ছিল না। আলোর এই কাফেলা পদে পদে বাধার মুখোমুখি হয়েছে। প্রথম দিনই বাধার মুখে পড়ে। আবু লাহাবের তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলেছিল, 'এইসব ছাইপাস শুনতেই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?' কিন্তু ইসলাম থেমে যায়নি। আবু লাহাবের তাচ্ছিল্য ও বাধা ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারেনি। ইসলাম হলো খোদায়ি আলো। আর আলোকে বেঁধে রাখা যায় না। আলোর কিরণচ্ছটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়বেই। আবু লাহাবের নাকে-মুখে ধুলো দিয়ে ইসলাম এগিয়ে যায়। দুনিয়াকে জয় করে নেয়। কিন্তু আবু লাহাবরা বসে থাকে না। একের পর এক ষড়যন্ত্র বুনে যায়। ইসলামের চিরন্তন আলোকে নিভিয়ে দিতে উঠে-পড়ে লাগে। নানাভাবে, নানা কৌশলে ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় জানাতে চায়। মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করতে, ঈমানি শক্তি দুর্বল করতে দলবেঁধে পায়তারা চালায়। সময় বয়ে যায়। মুসলমানরা দুর্বল হতে থাকে। একসময় বিশ্বনেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের বিদায় ঘটে। মুসলমানরা ক্ষমতাচ্যুত, রাজ্যহারা হয়ে যায়। নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতে থাকে। মুসলমানদের বুকফাঁটা আর্তনাদ ও গগনবিদারী আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। হাজারে হাজারে লাখে লাখে মুসলিম ঘরছাড়া হতে থাকে। মুসলিম শরণার্থীর মিছিল দীর্ঘ হয়। সমুদ্রতীরে পড়ে থাকে আশ্রয়খোঁজা মুসলিম শিশুর নিথর দেহ!

মুসলমানদের এই দুর্গতি ও দুর্দশার কি কোনো শেষ নেই? তাদের এই গভীর খাদ থেকে কে টেনে তুলবে? এই অধঃপতন থেকে মুক্তির পথ কী? কার ওপর ভর করে মুসলিম বিশ্ব আবার তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে? কে সেই ক্রান্তিকালের ত্রাতা? দুর্দিনের বন্ধু?

মূলত এইসব প্রশ্নের উত্তরই এ বইয়ের পাতায় পাতায় খোঁজা হয়েছে। মুসলমানদের হারানো গৌরব ও লুপ্ত অতীত ফিরে পেতে কেমন প্রজন্ম দরকার এবং সেই প্রজন্মের কী কী গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তাদের ভেতর-বাহির, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধ কেমন হওয়া চাই– এসব ব্যাপারই খোলাসা করা হয়েছে। যাদের হাতে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছে, তারা কেমন মানুষ ছিলেন। কোন গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য তাদের অমন ত্যাগী ও উৎসর্গী করে তুলেছিল, তাই অনেকটা মেলে ধরা হয়েছে। বর্তমানের মুসলিম যুবাদের কোথায় কোথায় সমস্যা, কোথায় কোথায় দুর্বলতা ও অসহায়তা, তা অনেকটা দরদি মালির মতোই পরম যত্নে তুলে ধরা হয়েছে।

যারা ইসলামের হারানো গৌরবময় অতীত ফিরে পেতে চায়, এই বই তাদের পথ দেখাবে। যারা দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহকে গভীর খাদ থেকে টেনে তুলতে চায়, এই বই তাদের জন্য। যারা সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, যারা আদর্শ সমাজের রূপ দেখতে চায়, সর্বোপরি যারা একটা নিরাপদ মুসলিম বিশ্ব চায়, এই বই তাদের জন্য। এই বই প্রতিটি স্বপ্নবাজ মুসলিম তরুণের জন্য, যারা নিজেদের ইসলামের জন্য, ঈমানের পথে বিলীন করে দিতে চায়!

বইটির অনুবাদ সহজবোধ্য ও ঝরঝরে করার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তারপরও মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই সচেতন পাঠকমহলের কাছে যেকোনো ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এই বইয়ের অনুবাদে আমাকে নানা সুহৃদ নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। পরম করুণাময় তাদের ওপর আপন করুণার ধারা অবারিত করুন। আমিন।

ফারুক আযম,
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

- প্রশংসিত বিজয়ী প্রজন্ম ১১
- জাতির প্রাণ ইসলাম ১৪
- আমাদের প্রধান সমস্যা ১৭
- বিজয় যেভাবে আসে ১৯
- ঈমানের লালন ও পরিচর্যা ২৫
- ইসলামের সংস্কারকদের প্রধান কর্তব্য ২৬
- নারী-পুরুষ : অবদান উভয়েরই ৩০
- কুরআন-সুন্নাহর আয়নায় বিজয়ী প্রজন্ম ৩২
- জ্ঞাননির্ভর ও বাস্তববাদী প্রজন্ম ৩৮
- নিষ্ঠাবান ও খোদাভীরু প্রজন্ম ৪৪
- ইসলামি প্রজন্ম ৪৭
- জিহাদি ও দাওয়াতি প্রজন্ম ৪৯
- মানব সমাজে দরবেশ ৫৩
- মর্যাদাবান ও শক্তিশালী প্রজন্ম ৫৫
- ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থি প্রজন্ম ৫৯
- তাওবায় সমর্পিত প্রজন্ম ৬৪
- প্রত্যাশিত প্রজন্ম ৬৮
- এই উম্মাহর ক্ষয় নেই ৭১
- অনন্য গুণাবলি ৭৩
- চিরস্থায়ী উম্মাহ ৭৬
- এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির জাগরণ ৮১
- বোধের উদ্বোধন এবং জ্ঞানের উদ্ভাস ৮৪
- হৃদয়ের বন্দরে ঈমানি বিপ্লবের দাবানল ৮৬
- বিপ্লবের দায় ও দায়বদ্ধতা ৯০
- বিরামহীন কর্মস্পৃহাসঞ্চারী বিপ্লব ৯২
- শিক্ষিত যুবসমাজের বিপ্লব ৯৫
- নারী-পুরুষের বিপ্লব ৯৯
- বৈশ্বিক ও সর্বজনীন বিপ্লব ১০৩
- দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন ১৭৭

প্রশংসিত বিজয়ী প্রজন্ম

আমার কাছে এক বন্ধু এলো। তার চোখে-চেহারায় ছোপ ছোপ বিস্ময়। বুকবিদ্ধ বিষণ্নতা তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। হেলে-দুলে পড়ি-মরি করছে।

কেন?

বৈরুতের নির্মম হত্যাযজ্ঞ তাকে নির্বাক করে দিয়েছে, অস্থির করে তুলেছে। সবরা ও সাতিলায় হাজারো মুসলিম লাশ হয়েছে, রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। নির্বিচারে শিশু, নারী, বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়েছে নির্ভয়ে, নির্লজ্জভাবে। গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঘর-বাড়ি। নির্মমভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তাদের শেষ আশ্রয়টুকুও!

আরবরা কোথায় তাহলে?

আরবরা তো বটেই সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নীরব, নিশ্চুপ। যেন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে তাদের মাঝে। কোথাও কোনো রা শব্দটি নেই। নেই কোনো হৃৎকম্পন, প্রাণের তড়পানি। আর সভ্য পৃথিবী নির্বাক তাকিয়ে ছিল শুধু। না দিয়েছে কাউকে আশ্রয়, না কোনো আশ্রিতকে সরিয়েছে! 'আচ্ছা এসব কি তুমি দেখনি? শোনোনি?'

আমি জবাব দিই– 'শুনেছি তো, কেন শুনব না? এই নির্মম গণহত্যা দেখে দেখেই তো কোনোরকম বেঁচে-বর্তে আছি। হৃদয় ফেটে যায়। শিরা-উপশিরা কেঁপে ওঠে, রক্ত লাফিয়ে ওঠে। আরবদের পরাজয় আর মুসলমানদের অক্ষমতা দেখতে দেখতে মন বিষিয়ে ওঠে।'

তার আগেও মুসলিম দেশগুলোতে যুদ্ধের দামামা বেজেছে। হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর বিরান হয়েছে। শহরের বাসিন্দাদের লাশের মিছিল গিয়েছে। মসজিদ গুঁড়িয়ে হয়েছে। নামাজরত মুসল্লিদের বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। মুসলিম মা-বোনের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আব্রুহীন হয়েছে হাজারো মুসলিম রমণী। কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। নেই কোনো প্রতিউত্তর। কি আরব কি মুসলিম, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সবাই নীরব, নির্বিকার। অত্যাচারী নিপীড়কের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার কেউ নেই। বুক চেতিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানোর মতো কোনো

মর্দে মুমিন নেই। হুংকারে-হুংকারে কাঁপিয়ে তোলার মতো ব্যাঘ্রব্যক্তিটি আজ কোথায়? দুর্বল ও নিপীড়িতদের পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো সাহসী কোনো মুসলিম কি নেই? সর্বত্র অদ্ভুত কবরের নীরবতা! রাতের গভীর নিস্তব্ধতা চেপে বসেছে পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়ে। চারদিকে নিঃসীম শূন্যতা। কোথাও কেউ নেই!

তবে মাঝে মাঝে তাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। তাদের বিকট চিৎকার তোমার কান ঝালাপালা করে তুলবে। সেই চিৎকার কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে নয়; নিজেদের বিরুদ্ধেই। নিজেরই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে তাদের ভোঁতা হাতিয়ার! আর যদি কখনো তাদের বেশ চেতনাদীপ্ত হয়ে বীরদর্পে লড়ে যেতে দেখ, তাহলে বুঝে নেবে, অন্য কোনো মুসলিম শাসককে উৎখাত করতে তখন তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। মনে হয় যেন তারা সাহাবাচরিত্রের বিপরীত হওয়ার জন্য গোঁ ধরে বসেছে। কারণ, সাহাবারা ছিলেন–

> ‘কাফিরদের প্রতি অতিশয় কঠোর আর নিজেদের মাঝে পরম কোমল।’ সূরা ফাতাহ : ২৯

অপরদিকে এরা নিজেদের মাঝে খুবই হিংস্র, অথচ শত্রুদের প্রতি সদয়-সহৃদয়; মুমিনদের প্রতি খড়্গহস্ত, কাফিরদের জন্য বিনয়াবনত। যেন কুরআনে বর্ণিত ইহুদিদের গুণাবলি তাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> ‘তাদের নিজেদের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি তীব্র, আপনি মনে করেন তারা ঐক্যবদ্ধ। আসলে তাদের হৃদয় বিক্ষিপ্ত। কারণ, তারা এক নির্বোধ জাতি।’ সূরা হাশর : ১৪

এবার আমার বন্ধু হকচকিয়ে বলে উঠে– ‘কিন্তু এই নিকষ-কালো অন্ধকারের কি কোনো অন্ত নেই? দীর্ঘ এই রাতের অবসান হবে কি? রাতের আঁধার ছিঁড়ে কি সকালের কোমল আলোয় পৃথিবী উদ্ভাসিত হবে না? এই জাতির কি এখনও আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিনে নেওয়ার সময় হয়নি? আর কত পথ চললে সৎ পথে ফিরে আসার উপলব্ধি হবে? এখনও কি শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে লড়ে যাওয়ার সময় হয়নি? কখন একই মঞ্চে এসে সমস্বরে গেয়ে উঠবে বিজয়ের গান? আর কতকাল নিজেদের গর্দান নিজেরা কাটবে? এখনও কি বিস্মৃতি থেকে জেগে উঠার সময় হয়নি? এখনও কি এই জাতির পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে সামনে চলার সময় আসেনি? আর কতকাল এই নিঃসীম অন্ধকারে পরাজয়ের ব্যর্থতা আর গ্লানি নিয়ে পথ চলবে? কখন মিলবে জয়ের দেখা? এই দুর্দিনের কি অবসান হবে না? আলোয় স্নাত সোনালি দিনগুলো কি আর আসবে না? ইয়ারমুকের যুদ্ধে ত্রাতা হয়ে আসা কোনো খালিদ কি আর আসবে না? কাদেসিয়া প্রান্তরের দুর্বিনীত বীর সেনানী সাদের আবির্ভাব আর হবে না? আজনাদাইনের মতো কোনো আমির কি হুংকার দেবে না? কিংবা স্পেনের মাটিতে তারিক বিন জিয়াদের দেখা মিলবে না? হিত্তিনের ময়দানে কি কোনো সালাউদ্দিনের জন্ম হবে না? কিংবা আইনে জালুত এবং কনস্টান্টিনোপল পদানত করা কুতুজ ও মুহাম্মদ ফাতিহের জন্ম দেওয়া মুসলিম মায়েরা কি বন্ধ্যা হয়ে গেছে?’

আমি স্থির-শান্ত কণ্ঠে বললাম– 'হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। এত ভেঙে পড়লে কি চলে? হতোদ্যম নয়; আমাদের হতে হবে আরও শক্ত মনোবলশালী। সবকিছুতেই আল্লাহ তায়ালার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। তাতে কোনো হেরফের হয় না। আঁধার কেটে যাবে। অবশ্যই সকালের রাঙা আলোয় উদ্ভাসিত হবে প্রতিটি জনপদ, পুরো বিশ্ব। আর শেষ রাতের অন্ধকার একটু বেশিই জমাটবদ্ধ হয়। কিন্তু ক্ষণিক বাদেই সেই অন্ধকার কেটে যায়। ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে ওঠে। ভোরের আলো ফোটে, অরুণোদয় হয়। এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। তাই আমাদের খোদায়ি নিয়মের প্রকৃতি মাথায় রেখেই চলতে হবে। নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টা ধরে রাখতে হবে। কিছুতেই পিছু হঠা যাবে না। খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। সন্তর্পণে এগোতে হবে। আর দুটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।'

বিজয় যেভাবে আসে

বিজয় হেসে-খেলে আসে না। এলোপাতাড়ি কর্মে বিজয়ের দেখা মেলে না। মাতাল উদ্ভট উটের পিঠে চড়েও বিজয় আসে না। বিজয় এত সহজ ব্যাপার না যে হাত বাড়ালেই কাছে চলে আসবে!

বিজয়ের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি, পথ-পদ্ধতি আছে। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বান্দাদের সতর্ক করেছেন। নিয়ম-নীতি ও কৌশল মেনে চলার প্রতি জোর দিয়েছেন।

প্রথম কৌশল

বিজয় তো আল্লাহর হাতেই। যাকে তাঁর পছন্দ তাকেই তিনি বিজয় দান করেন। কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। সমগ্র দেশের আপামর জনতা মিলেও তাকে দমন করতে পারে না। সে হয়ে উঠে দুর্বিনীত, অদম্য ও অপরাজেয়। আল্লাহ যার কপালে পরাজয় লিখে রেখেছেন, তার বি জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। হতে পারে সে সৈন্যসংখ্যা ও রসদ-উপকরণে অনেক শক্তিশালী।

কুরআনে স্পষ্টভাবে এই কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। ইরশাদ হয়েছে—

> ‘যদি আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করে, পরাজিত করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদের পরাজিত করেন, এমন কেউ কি আছে যে তোমাদের বিজয়ী করতে পারে? আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।’ সূরা আলে ইমরান : ১৬

অন্য আয়াতে ইরাশদ হয়েছে—

> ‘স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে বললেন— আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফেরেশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এ জন্যই দিয়েছেন— যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়; কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।’ সূরা আনফাল : ৯-১০

আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো কমসংখ্যক লোককে অধিকসংখ্যক সৈন্যের ওপর বিজয় দান করেন। যেমনটা তালুতের বিজয়, তাঁরা সংখ্যায় ছিল কম অথচ তারা জালুতের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর জালুতের সৈন্যসংখ্যা ছিল অধিক। তালুতের সৈন্যদের কেউ কেউ জালুতের সৈন্যসংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মিনমিন স্বরে বলেছিল–

> ‘জালুত ও তার সৈন্যদের ওপর বিজয়ী হওয়ার কোনো শক্তিই আমাদের নেই। আর যারা আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিল তারা বলল– আল্লাহর রহমতে কত ছোটো দলই বড়ো দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ সূরা বাকারা : ২৪৯

আল্লাহ কখনো কখনো নিরস্ত্র, সৈন্য-সামন্তহীন মানুষকেও সাহায্য করেন। যেমন রাসূল ﷺ-কে গুহায় সাহায্য করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> ‘যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না করো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন– যখন কাফিররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল। তিনি হলেন দুজনের দ্বিতীয়জন– যখন তাঁরা গুহায় ছিলেন। তিনি সঙ্গীকে বলেছিলেন– “চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁকে এমন সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, যাদের তোমরা দেখনি। আর কাফিরদের মাথা নীচু করে দিলেন। আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত, আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।’ সূরা তাওবা : ৪০

দ্বিতীয় কৌশল

বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আল্লাহই বিজয় দান করেন। বিজয় দেওয়ার পেছনে কিছু কারণ থাকে। আর তা হলো আল্লাহকে সাহায্য করা তথা আল্লাহর কাজে এগিয়ে আসা। খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করা। আল্লাহর জন্যই কাজ করা। তবেই আল্লাহ সাহায্য করবেন, বিজয় দেবেন। আর এই কথাই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অনেকটা শর্তজুড়ে দেওয়ার মতো করেই, ইরশাদ হয়েছে–

> ‘ওহে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবেন, তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।’ সূরা মুহাম্মাদ : ৭

অন্য জায়গাতেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে বলার ধরন ও আঙ্গিকে কিছুটা ভিন্নতা নিয়ে। অনেকটা দৃঢ়তা ও প্রত্যয় নিয়ে, পণ ও শপথ করে। সংবাদ দেওয়ার ঢঙে কুরআন বলছে–

> ‘আর কসম! আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে, যে আল্লাহকে সাহায্য করবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।’ সূরা হজ : ৪০

বিজয় অর্জিত হবে কেবল আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করলে, দ্বীনের বাণীকে সমুন্নত করলে এবং মানবজাতির মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করলে। এই সম্পর্কে কুরআনে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের অব্যবহিত পরে বলা হয়েছে–

> ‘আর তাদের যদি আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সমস্ত কিছুর পরিণাম তো আল্লাহর কাছেই।’ সূরা হজ : ৪১

কুরআন আরও নানাভাবে এ কথা বলেছে যে সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে তা ঈমান, আল্লাহর জন্য লড়াই করার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ জন্যই ঈমান আনবে, তার জন্য জিহাদ করবে, অবশ্যই বিজয় তার পদচুম্বন করবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> ‘আর এটা সত্য যে মুমিনদের বিজয়ী করার দায়িত্ব আমার ওপরই।’ সূরা রুম : ৪৭

তিনি আরও বলেন–

> ‘নিশ্চয় আমার সৈন্যরাই বিজয়ী।’ সূরা ছফফাত : ১৭৩

তৃতীয় কৌশল

বিজয় তো আসবেই। মুমিনদের জন্যই বিজয়। তবে তা মুমিনদেরই অর্জন করে নিতে হবে– নিজেদের যোগ্যতায় ও আপন শক্তিতে। আর তাদের জন্যই বিজয়। তারাই বিজয়ের লক্ষ্য ও উপকরণ। এই ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মানিত রাসূলকে সম্বোধন করে বলছেন–

> ‘তিনিই আপনাকে এবং মুমিনদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের মন ও মতের মিল করেছেন।’ সূরা আনফাল : ৬২ ও ৬৩

আল্লাহ কখনো কখনো ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়। যেমন : বদর, খন্দক ও হুনাইনের ময়দানে করেছেন–

> ‘আর স্মরণ করুন সেদিনের কথা, যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন– তোমরা মুমিনদের সুসংহত করো, আমি তোমাদের সাথে আছি।’ সূরা আনফাল : ১২
>
> ‘অতঃপর আমি তাদের কাছে দমকা বায়ু ও এমন সৈন্যদের পাঠিয়েছি, যাদের তোমরা দেখতে পাও না।’ সূরা আহজাব : ৯
>
> ‘অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন এবং এমন সৈন্যদের পাঠিয়েছেন– যাদের তোমরা দেখতে পাও না। আর যারা কুফুরি করেছে, তাদের তিনি শাস্তি দিয়েছেন।’ সূরা তাওবা : ২৬

আল্লাহ কখনো কখনো মানুষকে প্রকৃতির নানা অনুসঙ্গ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। কখনো প্রকৃতিকে মানুষের অনুগত করে দেন, কখনো-বা বৈরী করে তোলেন। যেমন, খন্দকের যুদ্ধে

মুশরিকদের ওপর বাতাসকে বৈরী করে তোলেন। সেদিনের তুমুল ঝড়ো হাওয়ায় লন্ডভন্ড হয়ে যায় মুশরিকদের তাঁবু! সে দিকে ইঙ্গিক করে কুরআন বলছে–

> ‘অতঃপর আমি তাদের কাছে তুমুল ঝড়ো হাওয়া পাঠাই।’ সূরা আহজাব : ৯

বদরের যুদ্ধে বৃষ্টিপাত হয়। সেই বৃষ্টির ধারা খোদায়ি করুণা-ধারারূপে বর্ষিত হয়, যা মুমিনদের পঙ্কিলতা দূর করে, সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। তার বিবরণ কুরআনে স্থান পেয়েছে এভাবে–

> ‘তিনি আকাশ থেকে তোমাদের কাছে বৃষ্টি অবতরণ করেন, যেন তোমরা পবিত্র হয়ে উঠতে পারো, শয়তানের প্ররোচনা ও দুর্বুদ্ধি দূর হয়ে যায়, হৃদয় ও মন যেন সুসংহত হয় এবং তোমাদের কদম যেন সুদৃঢ় হয়।’ সূরা আনফাল : **১১**

আবার আল্লাহ কখনো কখনো মুমিনদের শত্রুদের দ্বারাও সাহায্য করেন। তাদের হৃদয়ে ভয় ঢুকিয়ে দেন– যা তাদের মনোবল ভেঙে দেয়, ব্যক্তিত্ব দুর্বল করে ফেলে। আর ঠিক এমনটাই ঘটেছে ইহুদিগোত্র বনু নাজিরের বেলায়। কুরআন সেই ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছে এভাবে–

> ‘তিনিই আহলে কিতাবের কাফিরদের প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের ঘর থেকে বের করে দেন। তোমরা চিন্তাও করোনি যে তারা বিতাড়িত হবে। তারা ভেবেছিল, তাদের দুর্ভেদ্য কেল্লা আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করবে। এমন এক জায়গা থেকে আল্লাহর শাস্তি নেমে এলো, যার ব্যাপারে তারা ভাবতেই পারেনি। তিনি তাদের হৃদয়ে ভয় ঢেলে দেন। তারা নিজেদের ও মুমিনদের হাতে ঘরবাড়ি ধ্বংস করে ফেলে। সুতরাং হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা! তোমরা সতর্ক হও।’ সূরা হাশর : ২

কিন্তু বিজয়ের এই সব কলাকৌশল ও মাধ্যমগুলো মুমিনদের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। বদর যুদ্ধে ফেরেশতারা এসে অংশগ্রহণ করেছে বটে, তবে তা হাওয়ার ওপর আসেনি; বরং এসেছে মুমিনদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর। আল্লাহ তাদের বলেছেন–

> ‘আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা মুমিনদের সুসংহত করো।’ সূরা আনফাল : **১২**

আহজাবের যুদ্ধে দমকা বায়ু ও সৈন্য পাঠিয়েছেন– যখন মুমিনরা অসহায় হয়ে পড়েছিল, বিপদের আশঙ্কা করেছিল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> ‘মুমিনরা বিপাকে পড়ে যায় এবং প্রবলভাবে হেলে পড়ে।’ সূরা আহজাব : **১১**

হুনাইনের যুদ্ধেও আল্লাহর সাহায্য আসে। কুরআন বর্ণনা করছে–

> ‘আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন।’ সূরা তাওবা : ২৬

বনু নাজিরের যুদ্ধেও আল্লাহর সাহায্য এসেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> ‘তারা আপন হাতে ও মুমিনদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে।’ সূরা হাশর : ২

নারী-পুরুষ : অবদান উভয়েরই

বিজয়ী প্রজন্ম মূলত নারী ও পুরুষকে নিয়ে গঠিত হবে। ঈমানের আলোয় প্রোজ্জ্বল ও অনুগত মুসলিম নর-নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই এই প্রজন্ম প্রাণ পাবে। আর ইসলামে নারী তো পুরুষের সহযোগী; একে অপরের পরিপূরক। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

> ‘তোমরা একে অন্যের অংশ।’ সূরা আলে ইমরান : **১৯৫**

নারী যে পুরুষের সহযোগী, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ তায়ালার কথায়। তিনি আদম (আ.)-কে বলেন–

> ‘তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো।’ সূরা বাকারা : **৩৫**

আর নারীও পুরুষের মতো দায়বদ্ধ। যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে–

> ‘তোমরা উভয়েই এই গাছের নিকটবর্তী হবে না।’ সূরা বাকারা : **৩৫**

আবার নারী প্রতিদান থেকে বঞ্চিতও হবে না। যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে–

> ‘নিশ্চয় আমি নারী কিংবা পুরুষ কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করি না।’ সূরা আলে ইমরান : **১৯৫**

আল্লাহ তায়ালার বার্তা নিয়ে রাসূল ﷺ যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন ইসলামের বিজয়-মিশনে, দাওয়াতের ময়দানে এবং দুনিয়ার বুকে ইসলামের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আচ্ছা, ইতিহাস কি ইসলামের ঊষালগ্নে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা ভুলতে পারবে? ইসলামের প্রথম শহিদ সুমাইয়া (রা.) যে প্রবল শাস্তি ও কঠিন নিপীড়নের মুখেও অটল ছিল, এমনকী শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল, তবুও ইসলাম ত্যাগ করেনি– এই বীরাঙ্গনার কথা কি ইতিহাসে বিস্মৃত হতে পারে? অথবা হিজরতের দিন অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া আসমা বিনতে আবু বকরের কথা? উহুদের দিন অভাবনীয় বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উম্মে উমারা বা নাসিবার কথা? হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের বীরত্ব কিংবা নবিজির জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে উম্মুল মুমিনিনদের ত্যাগ ও বিসর্জনের কথা কি ইতিহাস ভুলতে পারবে?

মুসলিম রমণীরা তো আপন সন্তানকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দেবে, সাহসী করে তুলবে। স্ত্রী তো স্বামীকে জীবনবাজি রাখতে যুদ্ধে ঠেলে দেবে। মুমিন নারী এভাবেই আল্লাহর রাস্তায় নিজের ত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে ভূমিকা রেখে যায়। যে নারী জ্ঞানী ও বিদুষী, সে অন্যের কাছে কুরআনের শিক্ষা ও হাদিসে মর্ম পৌঁছে দেবে, দ্বীনের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে। বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা নিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে। ভালো কাজের প্রতি মানুষকে নির্দেশ দেবে এবং খারাপ ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করবে। এমনকী খলিফাও যদি ভুল করে, তাঁকে শুধরে দিতে; মিম্বারে দাঁড়াতে হলেও পিছপা হবে না।

নারী সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য– যার উপস্থিতি সমাজকে সচল রাখে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

> ‘আর মুমিনরা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। আর আল্লাহ তাদের অচিরেই সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।’ সূরা তাওবা : ৭১

আর এটা তো বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার যে নারীরা অতীতের মতো বর্তমানেও এগিয়ে আসবে। নানা কাজে ও বিভিন্ন উদ্যোগে নিজেকে তুলে ধরবে। ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বানে অবদান রাখবে। ইসলামের নবজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-বিনির্মাণে মনোযোগী হবে। স্বামীকে ইসলামি কাজে ও আন্দোলনে সাহায্য করবে। নিজের সন্তান-সন্ততিদের ভালো কাজে উৎসাহ জোগাবে। নারীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করবে। কারণ, তারা সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী। তাদের বাদ দিয়ে কিছুতেই ইসলামি সমাজ গড়া সম্ভব নয়।